34

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 13 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

নিরক্ষরতা, শিক্ষাদান ও শিক্ষকতা

ডঃ মালিহা খাতুন

শিক্ষা ছাড়া মানুষ আত্মবিকাশের সুযোগ পায় না। মানুষের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে তাকে মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। আত্মবিকাশের সুযোগ তো পরের কথা, স্বাক্ষর করার মতো শিক্ষাই বা আমরা কতজন পাচ্ছি? বিদ্যা লাভ মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষের হিতাহিত, বিবেচনা শক্তি, ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্য, অকর্তব্য নির্ধারণ শক্তি বিদ্যা শিক্ষায় বৃদ্ধি পায়। বিদ্যা বলে মানুষ আপনার ও পরের সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের সমূহ কল্যাণ করতে পারে। একমাত্র সুশিক্ষার মাধ্যমেই মানবিক, চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষকতা লাভ করা যায়। আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যত সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি এসব জানা সত্ত্বেও আমরা এখনও অজ্ঞানের অন্ধকারে। সেই কবে দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছেন, "Educated man are as much superior to the uneducated as the living to the dead." পবিত্র হাদিসের বাণী তো প্রণিধানযোগ্য "বিদ্বান ব্যক্তি নবীতের অধিকারী" "শৈশবের দোলনা হইতে আরম্ভ করিয়া কবরে না যাওয়া পর্যন্ত জ্ঞানার্জন কর এবং প্রয়োজনবোধে চীনে যাও।"

"জ্ঞানহীনেরা অনুচিবিলম্বে জ্ঞানান্বেষণ করিবে, বিদ্বানগণ তাহা যোগাইবেন।"

আমরা এইসব ধর্মীয় কথাও ভুলে গেছি, নবীর ওপর তার পড়েছিল কিছু মানবগোষ্ঠীর শিক্ষার। এভাবে কালে কালে শিক্ষার ভার কোন গোষ্ঠীবিশেষ বা কোন ব্যক্তিবিশেষের ওপর ন্যস্ত হয়। তারাই হন শিক্ষক যে শিক্ষা জাতি গঠন করে তার প্রধান ধারক ও বাহক হচ্ছে শিক্ষক দেশের নিরক্ষরতা দূর করে সেখানে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালানো, অন্ধের চোখে আলো দেয়া, মূক মুখে ভাষা দেয়ার ব্যাপারে শিক্ষক যুগে অগ্রণী। গ্রামে গ্রামে এ বিরাট শিক্ষিত বাহিনী ছড়িয়ে আছে। সেখানে তারাই শিক্ষা ও জ্ঞানের মশাল হাতে শত দুঃখ-দুর্দশায় স্থির ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞতাবে মিশনারির মতো কর্তব্য সম্পাদন করে যাচ্ছেন। শিক্ষকরা শুধু ছেলের শিক্ষক নন, তাঁরা অভিভাবকদেরও শিক্ষক, তাঁদের বন্ধু ও উপদেষ্টা। সুখে-দুঃখে তারা শিক্ষকদিগকে কাছে ডাকেন, আলাপ করেন ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে, নিজের সম্পর্কে উপদেশ চান, পরামর্শ চান প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা করেন। শিক্ষকদের উপর তাদের গভীর আস্থা বিদ্যমান। সময় সময় গ্রাম্য বিরোধের সালিশ মীমাংসার ভারও পড়ে শিক্ষকদের উপর। এভাবে নানা দিক হতে সমগ্র গ্রাম্য জনসাধরণের সাথে তাদের নাড়ীর যোগ প্রতিষ্ঠা হয়। তাই সর্বজনীন শিক্ষা তথা নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে কোন অভিযানে এদের দায়িত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। অক্ষরজ্ঞান প্রদান ছাড়াও শিক্ষকরা জনসাধারণকে কৃষির ও কৃষকের উন্নতিতে সমবায়ের ভূমিকা, সামাজিক শ্রম দ্বারা খাল কাটা, রাস্তা বাঁধা, স্কুল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যাপারেও বাস্তব ও গঠনমূলক শিক্ষা দিতে পারেন।

নিরক্ষরতা একটি ব্যাপক সামাজিক ব্যাধি। এই বাধা সরানোর জন্য যে প্রচেষ্টাই নেয়া হোক না কেন তাতে ব্যাপক জনসমর্থন থাকা চাই। জনসমর্থনহীন কোন পরিকল্পনাতেই জনগণ উৎসাহের সাথে কাজ করার প্রেরণা পায় না। তাই যে সরকার এ ধরনের একটি বৈপ্লবিক কাজে হাত দেবে তাকে সকল জনগণের আস্থাভাজন হতে হবে। এক কথায় গণতান্ত্রিক সরকারই গণশিক্ষার দায়িত্ব নিতে পারে। কারণ যেহেতু গণতান্ত্রিক সরকার জনগণেরই নির্বাচিত সরকার, সেহেতু জনগণও সে সকল নেতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তাদের কথা আস্থার সাথে গ্রহণ করে তার বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করবে।

গণতন্ত্রের অন্য একটা সুবিধাও আছে। সেখানে দেশব্যাপী সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলই সরকার পরিচালনা করেন। কাজেই এ ধরনের সরকার যদি একটা কাজে হাত দেয়, স্বভাবতই সেখানে সরকারী কর্মচারী ছাড়াও একদল নিঃস্বার্থ কর্মীও তাদের দলীয় সরকারের কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রাণপণ চেষ্টা করে। তখন এ ধরনের একটি কাজ জনগণেরই কর্মসূচী হিসাবে পরিগণিত হয়। কারণ শুধু সরকারের ওপর নির্ভর করে কোন বৃহৎ কাজ হয় না। জনসাধারণের প্রয়োজন হয় দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার জন্য শহরের ও গ্রামের দেশপ্রেমিক শিক্ষিত লোক উদ্যোগ ও উদ্যমের সাথে এগিয়ে আসেন, তবেই নিরক্ষরতার অভিশাপ মোচন হতে পারে।

আমাদের দেশের নারীসমাজ প্রদানসীন বিশেষ করে গ্রামের নারীরা। অথচ এদেশের নারী যে দেশের মোট জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ। তাঁদের উপেক্ষা করে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে কোন অভিযানই সফলতা লাভ করতে পারে না। গ্রামে নারী শিক্ষিকা এখন পাওয়া দুষ্কর নয়। যে সব গ্রামে নারী শিক্ষিকা বিরল। সেখানে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের মুখ্য দায়িত্ব থাকবে স্কুলের কিশোর-কিশোরী ছাত্রছাত্রীদের ওপর। তাদের পরিচালনা ও সংগঠনের ভার থাকবে শিক্ষকদের ওপরই। তাদের উপযুক্ত পরিচালনার কিশোর-কিশোরীরা এক্ষেত্রে চমৎকার অগ্রগতি বলেই আমি বিশ্বাস রাখি। গ্রামে প্রাপ্ত শিক্ষিতা নারীদের লাভজনকভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে কাজে লাগান যায় মহিলা সমাজকর্মীদের পরিচালনায় ও সহযোগিতায়।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস প্রতি জেলায়, উপজেলায় পালন করা উচিত। সেখানে উপস্থাপিত প্রখ্যাত শিক্ষাবিদদের সুচিন্তিত অভিমত, অভিজ্ঞতা সুপারিশসমূহ আরও নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা ও বাস্তবায়নের জন্য বছরে অন্তত দু'টি ফলোআপ ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পর্কে জাতীয় সংসদে ব্যাপক আলোচনা এবং এর ওপর একটি ঘোষণা দান প্রয়োজন।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যতদূর সম্ভব অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার কর্মসূচী প্রবর্তন করতে হবে। বয়স্কদের শিক্ষাদানের জন্য উদ্ভাবিত পদ্ধতি অবলম্বনে নিরক্ষরদের শিক্ষা দিতে হবে। প্রয়োজনবোধে গ্রাম সরকার ও ইউনিয়ন সরকারের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা যেতে পারে।

যদি জাতীয় সাক্ষরতা কাউন্সিল গঠিত হয়ে থাকে, তবে সেই কাউন্সিলের কাছে একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করা যেতে পারে। কমিটি সাক্ষরতা কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে কাউন্সিলের কাছে যথাসময়ে রিপোর্ট পেশ করবে।

এসব সাজেশন ছাড়া আরও কয়েকটি সুপারিশ এ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করছি। এসব সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে আমাদের শিক্ষিতের দেশের হার ২৩ শতাংশ থেকে অচিরেই ৭০ শতাংশে উন্নীত হবে। শ্রীলঙ্কার মতো দেশ নব্বই শতাংশে শিক্ষার হার পৌঁছে দিয়েছে, আমরা পারব না কেন। আমরা সবাই মিলে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে ব্রতী হই। প্রত্যেক অন্তত একজনকে শিক্ষাদান করব, তাহলে অচিরেই নিরক্ষরতা দূর হবে।

ইউনিয়ন পরিষদের সাক্ষরতা কার্যক্রমের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অথবা সদস্যকে

একটি সামাজিক সাক্ষরতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন গ্রামের মহিলারা

এতদসংক্রান্ত ব্যয় বহনের জন্য নির্ধারিত হারে ফিস, জরিমানা ইত্যাদি ধার্য করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেয়া হোক।

সাক্ষরতার কাজে উৎসাহী ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের উপযুক্ত পুরস্কার, পদক, সনদ ইত্যাদির দ্বারা স্বীকৃতি দেয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

সাক্ষরতা কার্যক্রমকে বাস্তবায়িত করে তোলার জন্য বাংলাদেশ জনশিক্ষা পরিচালনালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা বিভাগের মধ্যে সমন্বিতভাবে কাজ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নব্য-সাক্ষরদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য পত্রপত্রিকায় নিয়মিত ও সহজ একটি বিশেষ অঙ্গন থাকা প্রয়োজন।

শিক্ষিত সমাজ যাতে করে সক্রিয়ভাবে সাক্ষরতার কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তার জন্য সামাজিক চাপ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে ট্যাক্স আরোপ করতে পারে।

সাক্ষরতা কার্যক্রম সম্পর্কে গবেষণা ও মূল্যায়নের জন্য একটি বয়স্ক শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ ছুটির সময় শিক্ষক ও ছাত্র সমাজকে স্থানীয়ভাবে সাক্ষরতা কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে।

সাক্ষরতার জন্য জনমনে সচেতনতা ও আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাতে হবে।